CHILDREN'S BOOK TRUST
NEW DELHI
ভারতীয় ইতিহাসের গল্প

ভারতীয় ইতিহাসের গল্প

পুনর্কথন—শ্রী এ. কে. ঘোষ
অনুবাদ—শ্রীমতী প্রণতি চট্টোপাধ্যায়
চিত্রাঙ্কণ—শ্রীদেবব্রত মুখার্জি

সূচীপত্র

Legends of Indian History
By A.K. Ghosh
Illustrated by Debabrata Mukerji

First English Edition: 1968
Reprint: May 1970, May 1972, February 1975, May 1976, November 1979, October 1982, December 1985.

Bhartio Itihaser Galpa: Bengali translation by Smt. Pranati Chattopadhaya
First Bengali Edition: November 1979, December 1985.

ISBN 81-7011-313-X

CHILDREN'S BOOK TRUST NEW DELHI

Published by the Children's Book Trust, Nehru House, 4, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi, and printed at the Trust's press, the Indraprastha Press, New Delhi.

ভূমিকা

আমরা যখন ঐতিহাসিক ব্যক্তিরা কি বলেছেন ও কি করেছেন তা পড়ি, তখনই—ইতিহাস আমাদের মনে আরো উদ্দীপনা সৃষ্টি করে ও চিত্তাকর্ষক হয়ে ওঠে। এই সব গল্প কতটা সত্য তা কেউ জানে না কিন্তু বিশ্বাস করা হয় যে এগুলো নিছক কল্পনা প্রসূত নয়। এগুলো উপকথার পর্যায়ভুক্ত।

কেবলমাত্র কিছু লোকের কাজের বর্ণনা থাকলেই উপকথা হয় না, যদি না সেই সঙ্গে বলা হয় তাদের এরকম করার উদ্দেশ্য কি ছিল তা আমরা দেখতে পাই ও বুঝতে পারি। যেমন বৈশালীতে যা ঘটেছিল—নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধির জন্যে কয়েকজন মিলে একটা মহৎ উদ্দেশ্য কিভাবে বিনষ্ট করল তার দৃষ্টান্ত। আবার দেখি কখনও একটা বড় রকমের স্বার্থ ত্যাগ করা হয়েছে।

ভারতীয় ইতিহাস এই রকম উপকথায় পরিপূর্ণ। এই বইয়ে এই রকম কাহিনী কয়েকটা মাত্র কিশোরদের জন্য সংকলিত করা হয়েছে। ভবিষ্যতে এই পর্যায়ে এ রকম আরো গল্প প্রকাশ করা হবে।

একটি প্রজাতন্ত্র রাষ্ট্রের কাহিনী

আজ থেকে দু-হাজার বছরেরও আগেকার কথা। তখন উত্তর ভারতে বৈশালী নামে একটি প্রজাতন্ত্র রাষ্ট্র ছিল। স্মরণীয় কালের মধ্যে এইটি ছিল প্রাচীনতম প্রজাতন্ত্র রাষ্ট্র। যারা রাজ্য পরিচালনা করবেন, সেখানকার অধিবাসীরা তাঁদের নিজেদের মধ্য থেকে নির্বাচন করতেন।

বর্তমান মজঃফরপুর জেলা যেখানে অবস্থিত সেইখানে গঙ্গাতীরে বৈশালী রাষ্ট্র ছিল। সেখানকার অধিবাসীরা ছিলেন লিচ্ছবী নামে পরিচিত। তাঁদের কোন রাজা ছিল না। সেখানকার অধিবাসীরা তাঁদের রাষ্ট্রনায়ক নির্বাচন করতেন। তাঁকে রাজ্য পরিচালনায় যাঁরা সাহায্য করতেন তাঁরাও জনসাধারণের দ্বারা নির্বাচিত হতেন।

বৈশালী ছিল একটি সমৃদ্ধ দেশ। সেখানকার জমি ছিল খুব উর্বর। সেখানকার জমিতে নানারকম ফসল ফলত, আর ফুলে ফলে গাছ ভরে থাকত। ছোট বড় নদ নদী থেকে সেখানকার লোকেরা পরিষ্কার জল পেতেন। প্রয়োজনের সব জিনিষ তাঁদের ছিল বলে

সেখানকার অধিবাসীরা পরমানন্দে বাস করতেন।

বৈশালী রাষ্ট্রের রাজধানীর নামও ছিল বৈশালী। ইক্ষ্বাকু বংশের বৈশাল নামে এক রাজপুত্র এই রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বলে এই রাষ্ট্রের নাম হয় বৈশালী।

রাজধানী বৈশালী ছিল বেশ বড় ও সুন্দর সহর। এর পরিধি ছিল বিশ মাইলের মত। এর চারিদিকে মজবুত ও উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা ছিল। আর এই পাঁচিলের গায়ে সহরে ঢোকবার তিনটে গেট ছিল। প্রহরীরা সব সময়ে সজাগ হয়ে সে সব গেট পাহারা দিত। সহরের মধ্যে প্রাসাদের মত বড় বড় সোনার গম্বুজ-ওয়ালা ইমারৎ ছিল। কিছু কিছু বাড়ীর চূড়া আবার রূপা দিয়ে মোড়া। এ ছাড়াও তামা-মোড়া অনেক বাড়ী ছিল। লিচ্ছবী প্রজাতন্ত্রের এইগুলি ছিল ঐশ্বর্য ও সমৃদ্ধির নিদর্শন।

এখানকার অধিবাসীরা ছিলেন সম্ভ্রান্ত ও উচ্চমনা। অপরের প্রতি তাঁদের দয়া ও বন্ধুত্বের অভাব ছিল না। একতাই ছিল তাঁদের বল। তাঁদের আইনও কেউ অমান্য করত না। তাঁদের বীরত্ব, সাহস ও একতার জন্য অন্য কোন দেশ তাঁদের আক্রমণ করতে সাহস করত না।

প্রতিবেশী রাজারা এই সন্তুষ্ট-চিত্ত প্রজাতন্ত্রকে হিংসা করত, আর সুযোগ খুঁজত কি করে এই রাষ্ট্রকে পরাজিত

করে এর অধিবাসীদের পদানত করবে। কিন্তু বৈশালীর অধিবাসীরা সর্বদা সতর্ক থাকতেন ও যে কোন আক্রমণের বিরুদ্ধে যুঝতে প্রস্তুত থাকতেন। রাষ্ট্রের কয়েক জায়গায় যুদ্ধভেরী রাখা থাকত ও মাঝে মাঝে সেগুলো বাজান হত। সেই যুদ্ধভেরীর আওয়াজ শুনলেই লোকেরা যুদ্ধ করার জন্য অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে প্রস্তুত হয়ে তৎক্ষণাৎ উপস্থিত হয়ে যেত। তাঁরা দেশ রক্ষার জন্য কতটা প্রস্তুত তার পরীক্ষা এভাবে করা হত।

গঙ্গার এপারে লিচ্ছবী রাজ্য, অপর পারে মগধ। খৃষ্টজন্মের চার শ বছর আগে মগধের রাজা ছিলেন অজাতশত্রু। তিনি পাটলীপুত্র নামে একটি বড় নগর পত্তন করেন। বর্ত্তমানে সে পাটলীপুত্র সহরের নাম পাটনা। অজাতশত্রু প্রবল পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন। কিন্তু তাঁর অন্তরে দয়ামায়া ছিল না। কথিত আছে
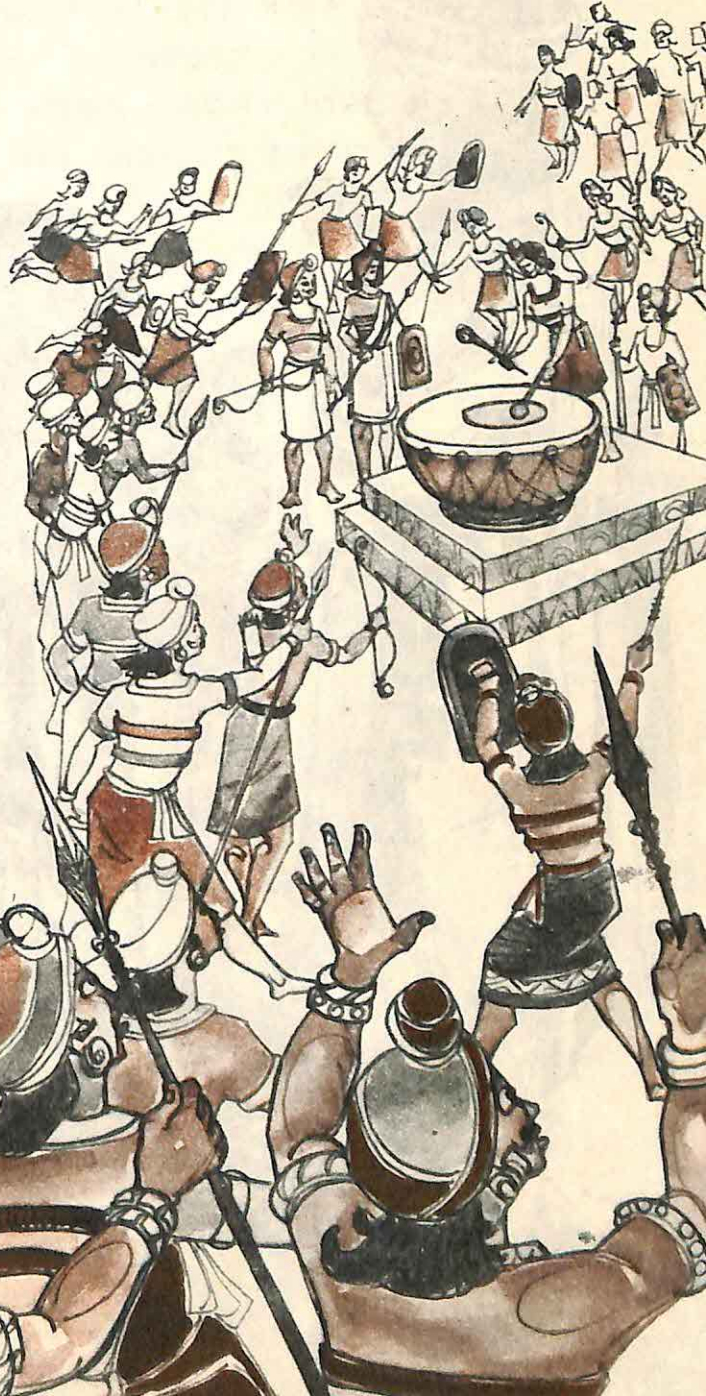
যে তিনি এত অসহিষ্ণু ছিলেন যে রাজ-সিংহাসনে বসার জন্য পিতার মৃত্যু পর্যন্ত তিনি অপেক্ষা করতে পারেন নি। পিতাকে হত্যা করেই তিনি রাজা হন।

বৈশালীর স্বাধীনতা অজাতশত্রু সহ্য করতে পারছিলেন না। এ রাজ্য জয় করে নেবেন এইটাই তার বাসনা ছিল। লিচ্ছবীদের যুদ্ধে পরাস্ত করে তাঁদের উপর আধিপত্য করার ইচ্ছাও তিনি পোষণ করতেন। কিন্তু লিচ্ছবীদের শৌর্যবীর্য ও অভূতপূর্ব একতার কথা স্মরণ করে এরকম সঙ্কটের সম্মুখীন হতে তিনি সাহস করতেন না।

অজাতশত্রুর একজন ধূর্ত ও কুচক্রী মন্ত্রী ছিলেন॥ নাম তার ভাস্যকার। মন্ত্রী বুঝতে পেরেছিলেন অজাতশত্রুর মনে বৈশালী জয় করবার প্রবল ইচ্ছা আছে। তিনি একদিন রাজাকে বললেন, "রাজাধিরাজ বৈশালী সম্বন্ধে আপনার মনোবাঞ্ছা আমি জানি। যদি আমার উপর আপনার বিশ্বাস থাকে আমি বৈশালীকে মগধের পদানত করাব।"

"মন্ত্রী, কি করে আপনি বৈশালীকে আমার করায়ত্ত করাবেন?"

"এটা আমার একটা পরিকল্পনা।"

"মহারাজ, আপনি এমন ভাব দেখাবেন যে আপনি আমার উপর খুবই রেগে গেছেন। আপনি আমাকে সবার সামনে অপমান করে দেশ থেকে বিতাড়িত করবেন। তারপর যা করবার আমি করব। আমি গোপনে আপনাকে সংকেত পাঠাব কখন বৈশালী আক্রমণ করতে হবে। আপনি সে সময় বৈশালী আক্রমণ করলে বৈশালী আপনার অধীনে আসবে।"

রাজা বুঝলেন, মন্ত্রী একটা সুচতুর অভিসন্ধি করেছেন। মন্ত্রীর কথামত তিনি তাঁর কার্যসিদ্ধি করে নিতে চাইলেন। ভায্যকারকে রাজা দেশ থেকে অপমান করে তাড়িয়ে দেবার হুকুম দিলেন।

ভায্যকারের মাথা মুড়িয়ে মুখে চুণকালি লেপে দেওয়া হল।

তারপর তাঁকে একটা গাধার পিঠে চাপিয়ে পাটলীপুত্রের বাহিরে তাড়িয়ে দেওয়া হল।

ভাষ্যকার গঙ্গা পার হয়ে বৈশালীতে পালিয়ে গেলেন। সেখানে পৌঁছে তিনি বললেন মগধের সম্রাট তাঁর প্রতি রুষ্ট হয়ে তাঁকে নির্বাসনে দিয়েছেন। তিনি আশ্রয় প্রার্থী হয়ে বৈশালীতে চলে এসেছেন।

লিচ্ছবীরা সরল ও উদার মনের ছিলেন। তাঁরা তাঁকে আশ্রয় ও তাঁর উপযুক্ত কাজও দিলেন। ভাষ্যকার বুদ্ধিমান ও পরিশ্রমী ছিলেন। ক্রমশঃ পদোন্নতি হতে হতে তিনি প্রধান বিচারপতির পদলাভ করলেন।

ভাষ্যকার তখন সকলের বেশ পরিচিত হয়ে উঠেছেন। তিনি অবাধে সকলের সঙ্গে মেলামেশা করেন। তিনি সবার প্রতি সদয় ও বিনয়ী ছিলেন। এমনভাবে তিনি সকলের প্রিয় ও বিশ্বাসের পাত্র হয়ে উঠলেন।

তিনি সকলের আস্থাভাজন হয়েছেন জেনে খুব খুসী হলেন। তাঁর দুরভিসন্ধির প্রথম পর্ব সফল হওয়ায় তাঁর প্রাথমিক সিদ্ধিলাভ হল।

এবার তিনি তাঁর কু-মতলবের দ্বিতীয় পর্ব স্বুরু করলেন। তিনি একের বিরুদ্ধে অন্যজনকে প্ররোচিত করতে লাগলেন। তাতে তাঁদের মধ্যে শত্রুতা বৃদ্ধি পেতে লাগল। ক্রমশঃ কৌশলে তিনি বৈশালীর অধিবাসীদের মধ্যে বিভেদ ও শত্রুতার বিষ ছড়ালেন। তাঁদের একতা নষ্ট করে দিলেন। তাঁদের মধ্যে দলাদলির সৃষ্টি হ'ল। পরস্পরের মধ্যে বিরোধ বৃদ্ধি পেতে লাগল। বৈশালীর এতদিন যে ঐক্য-শক্তি ছিল তা ধ্বংস হয়ে গেল।

ভাষ্যকার তাঁর সাফল্যে খুবই আনন্দিত হলেন। তিনি বুঝতে পারলেন তাঁর মতলব প্রায় পূর্ণ হয়ে এসেছে। কতদূর তাঁর পরিকল্পনা সফল হয়েছে দেখবার উদ্দেশ্যে অধিবাসীদের একবার পরীক্ষা করলেন। একদিন তিনি রণ-দামামা বাজাতে হুকুম দিলেন। মাত্র কয়েকজন লোকই সেই যুদ্ধের আহ্বানে সমবেত হল। ভাষ্যকার তা দেখে খুসী হলেন। তিনি বুঝলেন সময় হয়েছে। অজাতশত্রুকে বৈশালী আক্রমণ করার সংবাদ দিয়ে গুপ্তচর পাঠালেন।

অজাতশত্রু এই স্বুযোগের অপেক্ষা করছিলেন। এক বিরাট সৈন্যবাহিনী নিয়ে রাত্রে গঙ্গা পার হয়ে বৈশালীর দ্বারে এসে দাঁড়ালেন। ভাষ্যকার একটি দরওয়াজা খুলে রেখে ছিলেন। সেই উন্মুক্ত পথ দিয়ে অজাতশত্রুর সেনা বৈশালী প্রজাতন্ত্রে প্রবেশ করল।

তাঁর হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধার করবার জন্য তিনি সচেষ্ট হলেন। তাঁর স্বপ্ন ছিল— এক বিরাট সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করাবার, যেখানে তাঁর প্রজারা সুখে শান্তিতে বাস করবে।

ষোল বছরের যশোধর্মা স্থির থাকতে পারছিলেন না। তাঁর দেশ ও লোকদের দেখার জন্য তিনি অস্থির হয়ে পড়েছিলেন। প্রজারা কিভাবে দিন কাটাচ্ছে তা স্বচক্ষে দেখবার জন্যে ও শাসকদের প্রতি তাদের কি মনোভাব তাও জানবার জন্যে তাঁর মালওয়া যাবার ইচ্ছা হল। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল প্রয়োজন হলে তাদের উপর কতটা নির্ভর করা যাবে তাও সেই সঙ্গে যাচাই করে নেওয়া।

পিতার কাছে অনুমতি নিয়ে তাঁর কয়েকজন বিশ্বাসী বন্ধুর সঙ্গে দীর্ঘ পথের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। তারা প্রত্যেকে বেছে বেছে তাদের সব চেয়ে ভাল ঘোড়াতে চড়ে বসলেন। অনেক গ্রাম ও নগর পার হয়ে তারা চললেন।

পথে পড়ল ঘন জঙ্গল, দুর্গম পাহাড়, ভয়ঙ্কর নদী। এ সব তারা পার হয়ে এগিয়ে চললেন মালওয়ার উদ্দেশ্যে। কখনো অপরিচিত ভ্রমণকারী বলে পরিচয় দিয়ে দরিদ্র লোকেদের সঙ্গে রাত কাটালেন, কখনও বা রাজ অতিথি হয়ে রইলেন। কয়েকবার পথে ডাকাতদের সঙ্গে লড়াই করে তাদের প্রাণ বাঁচাতে হল, আবার কখনো ছোট খাট যুদ্ধও করতে হল। এই ভাবে তারা আপদ বিপদ কাটিয়ে চলতে লাগলেন।

একদিন তারা যখন ঘন জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিলেন যুবরাজ একটা বন্য বরাহ দেখতে পেয়ে তাকে তাড়া করলেন। বন্য বরাহটা এত জোরে ছুটতে লাগল যে তাকে ধরতে যুবরাজ নিজের সঙ্গীদের কাছ থেকে দূরে গিয়ে পড়লেন। তখন গ্রীষ্মকাল। এত জোরে বরাহ তাড়া করে আসায়

শত্রুর আক্রমণ ঘোষণা করে সব কটি রণ-দামামা বেজে উঠল। কিন্তু মাত্র কয়েকজন লোক যুদ্ধ করবার জন্য এগিয়ে এল। বৈশালীর পতন হল।

বিজয়ী রাজা অজাতশত্রু আটটা সাদা ঘোড়ায় টানা সোনার রথে চড়ে বৈশালীতে প্রবেশ করলেন। তাঁর নিজের সৈন্যরা তখন বৈশালী অধিকার করে ফেলেছে। তারাই তাঁকে সম্বর্দ্ধনা জানাল।

অজাতশত্রু এইভাবে বৈশালী প্রজাতন্ত্র জয় করে মগধ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করলেন। সেখানে তিনি তাঁর নিজের কর ও আইন বসালেন। লিচ্ছবীদের তিনি তাঁর ক্রীতদাস করে রাখলেন।
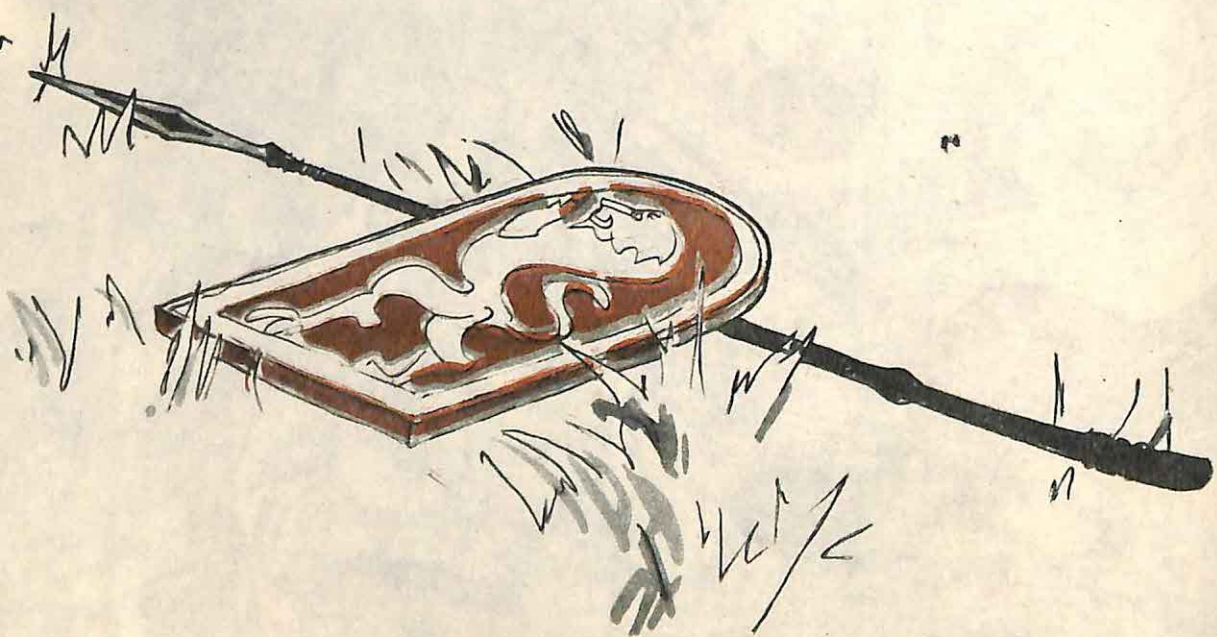
যুবরাজের প্রতিশোধ

বুদ্ধদেব তখনও জীবিত। সে সময়ে আমাদের এই ভারতবর্ষে কোশল নামে এক প্রসিদ্ধ রাজ্য ছিল। রাপ্তি নদীর তীরবর্তী খুব বড় সহর শ্রাবস্তী ছিল এই রাজ্যের রাজধানী। আর রাজা ছিলেন প্রসেনজিত। তিনি বুদ্ধের এক পরম ভক্ত ছিলেন। অনেক আশ্রম ও বুদ্ধ-মন্দির তিনি নির্মাণ করিয়েছিলেন। স্বয়ং বুদ্ধ সে সব আশ্রম ও মন্দিরে আসতেন। এখানে অনেক প্রসিদ্ধ ধর্মগ্রন্থ লেখা হয়েছিল। রাজ-প্রাসাদে পাঁচশত বৌদ্ধ ভিক্ষুকে প্রতিদিন অন্ন দান করা হত।

প্রসেনজিত একদিন শুনলেন ভিক্ষুরা তাঁর প্রাসাদে অন্ন গ্রহণ করেন না। তাঁরা যে সব অন্ন ব্যঞ্জন পান তা তাঁরা তাঁদের আত্মীয় অথবা বন্ধুদের বাড়ী নিয়ে গিয়ে সেখানে বসে আহার করেন।

এর কারণ অনুসন্ধান করে তিনি জানলেন ভিক্ষুরা সবাই শাক্য। ভগবান বুদ্ধ ও ওরা একই গোষ্ঠির লোক। তাঁরা মনে করেন তাঁরা কোশল রাজবংশের লোকের চেয়ে উচ্চ জাতি।

প্রসেনজিত অনেক চিন্তা করলেন কি করলে ওরা তাঁকে সমান সমান ভাববে। শেষে তিনি স্থির করলেন, “যদি আমি শাক্য বংশের কোন মেয়েকে বিবাহ করে আমার প্রধানা রাণী করি তাহলে শাক্যরা আর আমাকে নীচ জাতির লোক বলে মনে করবে না বরং সমান সমান ভাববে।”

রাজা প্রসেনজিত একটি শাক্য রাজকুমারীকে বিবাহ করবেন ঠিক করলেন। কিন্তু এ কাজে কি ভাবে অগ্রসর হওয়া যায় তা ভেবে স্থির করতে পারলেন না।

একদিন তিনি শিকারে বেরুলেন। একটা বুনো জানোয়ারকে শিকার করবার জন্য তার পিছু দৌড়লেন। ফলে তিনি সঙ্গীদের কাছ থেকে দূরে গিয়ে পড়লেন। একল একলা তিনি ঘোড়ায় চড়ে আরো

এগিয়ে যেতে লাগলেন। এভাবে অনেক দূর চলার পর তিনি একটি শাক্য রাজ্যে এসে পৌছলেন।

শাক্যরা যখন শুনল রাজা প্রসেনজিত তাদের রাজ্যে এসেছেন তারা এগিয়ে এসে যথোচিত সম্মান ও শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁকে সম্বর্ধনা করল। শাক্যদের অতিথি-পরায়ণতা দেখে রাজা খুবই সন্তুষ্ট হলেন। তাদের অতিথি হয়ে কিছুদিন তিনি কপিলাবস্তুতে রয়ে গেলেন।

একজন শাক্য রাজকুমারীকে বিবাহ করতে চান একথা তাদের তিনি জানালেন।

শাক্যরা তাঁর প্রস্তাব শুনে অবাক হয়ে গেল। রাজা প্রসেনজিতের কাছ থেকে তাঁরা এরকম প্রস্তাব আশা করেনি। প্রসেনজিতের সঙ্গে কোন রাজবংশের

মেয়ের বিবাহ দেবার ইচ্ছা তাদের ছিলনা। কিন্তু তারা তাঁর প্রস্তাব অমান্যও করতে পারেন না কারণ শাক্য রাজ্য ছিল তাঁর একটি অধীন রাজ্য।

শাক্যরা তখন কি করা যায় সকলে মিলে ভাবল। মহানামা ছিলেন শাক্যদের রাজা। তিনি বললেন তিনি প্রসেনজিতকে সন্তুষ্ট করতে পারবেন।

তিনি বললেন, "বাসবী নামে আমার এক মেয়ে আছে—তার মা আমার ক্রীতদাসী। এর এখন ষোল বছর বয়স, দেখতে পরমাসুন্দরী। আমি তাকে শাক্য রাজকুমারী পরিচয় দিয়ে রাজার সঙ্গে বিয়ে দেব।"

শাক্যরা সেই ক্রীতদাসীর কন্যাকে রাজকুমারী পরিচয় দিয়ে তাঁর সঙ্গে বিবাহ দিল।

বিবাহের পর নববধূকে নিয়ে তিনি রাজধানীতে ফিরলেন। এই উপলক্ষ্যে
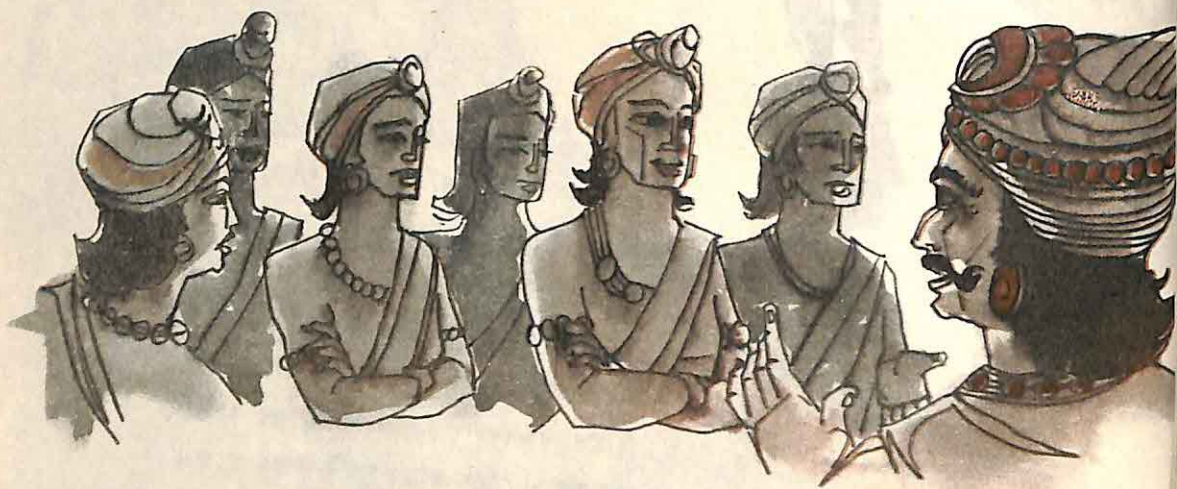
তাঁর সম্মানে সারা দেশে বিরাট সমারোহ পড়ে গেল।

সন্ধ্যার সময় রাজা প্রসেনজিত দেখলেন তার নববধূ কাঁদছে।

"তুমি কাঁদছ কেন? এখানে তোমার দুঃখ কি?" রাজা তাকে জিজ্ঞাসা করলেন।

বাসবী কাঁদতে কাঁদতে বললেন, "মহারাজ শাক্যরা আপনাকে ঠকিয়েছে। আপনার সঙ্গে ওরা ওদের কোন মেয়ের বিবাহ দিতে রাজী ছিলনা। কাজেই তারা আমাকে আপনার সঙ্গে বিবাহ দিয়েছে। আমি শাক্যদের দলপতি মহানামার কন্যা, কিন্তু আমার মা রাণী নন—আমার মা মহানামার একজন ক্রীতদাসী মাত্র।"

একথা শুনে রাজা প্রসেনজিত মর্মাহত হলেন ও তখুনি শাক্যদের উপর প্রতিশোধ নেবার সঙ্কল্প করলেন। কিন্তু দ্বিতীয়বার চিন্তা করে তাদের তিনি ক্ষমা করলেন। তাঁর স্ত্রীকে আলিঙ্গন করে অনেক সান্ত্বনা দিলেন। বাসবী কিন্তু একথা ভুললেন না। এই মানী রাজাকে প্রতারণা করার জন্যে তিনি শাক্যদের ঘৃণার চোখে দেখতে লাগলেন। যতই রাজার ভালবাসা বেশী করে পেতে লাগলেন ততই বেশী করে শাক্যদের উপর তাঁর ঘৃণা বাড়তে লাগল।

কিছুদিন কেটে গেল। বাসবীর একটি পুত্রসন্তান জন্মাল। দেখতে দেখতে সেই শিশু সুন্দর

স্বাস্থ্যবান যুবক হয়ে উঠল। তার নাম রাখা হল "বিরুধক"। বড় হয়ে সে প্রায়ই তার মাকে প্রশ্ন করত যদি তার দাদামশায় ও দিদিমা থাকে তবে তাকে কেন তাদের সঙ্গে দেখা করতে দেওয়া হয় না। অন্য সকলে তো তাঁদের দাদামশায় ও দিদিমার সঙ্গে দেখা করে।

তার মা বলতেন যে তার দাদামশায় বহু দূরে থাকেন। তিনি একজন শাক্যদের রাষ্ট্রনায়ক। বিরুধক মার কাছে তাঁর দাদামশায়কে দেখতে যাবার জন্যে বারবার অনুমতি চাইত। শেষে তাঁর মা আর যখন তাকে থামিয়ে রাখতে পারলেন না, তখন তাকে দাদামশায়ের কাছে যাবার অনুমতি দিলেন। তিনি তাঁর বাবার কাছেও খবর পাঠালেন তাঁর ছেলে বিরুধক তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছে।

কোশলের যুবরাজ আসছে শুনে শাক্যরা আদৌ খুসী হল না। একজন ক্রীতদাসীর কন্যার পুত্রকে, যুবরাজ হলেও, সম্মান দেখিয়ে অভ্যর্থনা করতে হবে এটা তাদের আদৌ মনঃপূত হচ্ছিল না। কিন্তু অন্য উপায়ও ছিল না তাদের। সব রকম সৌজন্য তাঁকে দেখাতে হল।

বিরুধক যখন মন্ত্রণালয়ে ঢুকলেন তাঁকে প্রথাগতভাবে অভ্যর্থনা জানান হল কিন্তু তার মধ্যে প্রাণ ছিল না। বিরুধক বুঝতে পারলেন তিনি তাঁর দাদামশায় ও অন্যান্য সকলের কাছে ঠিকমত আদর যত্ন পাচ্ছেন না। কিন্তু কেন তারা ওকে সে রকম আদর যত্ন করছে না, তা তিনি বুঝতে পারছিলেন না।

তিনি কিছুদিন তাঁর দাদামশায়ের কাছে থেকে নিজের দেশে ফেরবার জন্য রওনা হলেন। তাঁর একজন সঙ্গী দেখল বিরুধক একটি বর্শা ফেলে এসেছেন। সে সেটা আনতে ফিরে গেল। যে মন্ত্রাণালয় থেকে তারা একটু আগে বেরিয়ে এসেছিল, সেখানে ঢুকে দেখে বিরুধক যে আসনে বসে ছিলেন সেটা একজন ক্রীতদাসী ধুচ্ছে। এই দেখে তার বড় আশ্চর্য লাগল। সে ক্রীতদাসীকে জিজ্ঞাসা করল কেন সে ঐ জায়গাটা ধুচ্ছে।

"ধোব না! এখানে একজন ক্রীতদাসীর ছেলে যে বসেছিল। ওর মা বাসবী যে একজন ক্রীতদাসীর মেয়ে।" —দাসী স্পষ্ট জবাব দিল।

তাঁর সঙ্গী সঙ্গে সঙ্গে বিরুধককে এ কথা জানাল। এ কথা শুনে বিরুধক খুবই ক্রুদ্ধ হলেন।

তিনি বাড়ী ফিরে এসে মাকে জিজ্ঞাসা করলেন 'ক্রীতদাসী যা বলেছে তাঁর অর্থ কি?'

মা বললেন, "হ্যাঁ বাবা, এটা সত্য কথা। আমার মা ছিলেন ক্রীতদাসী কিন্তু আমার বাবা মহানামা হচ্ছেন শাক্যদলপতি। আমি রাজবংশে জন্মেছি, আমি রাজকন্যা এই বলে শাক্যরা তোমার বাবাকে ঠকিয়ে আমার সঙ্গে বিয়ে দিয়েছিল।

বিরুধক চীৎকার করে বলল, "আমার বাবাকে ঠকানোর প্রতিশোধ আমি নেব।"

আরো কিছুদিন কাটল। প্রসেনজিতের মৃত্যুর পর যুবরাজ বিরুধক হলেন কোশলের রাজা। তিনি তাঁর প্রতিজ্ঞার কথা ভুললেন না। এক বিরাট সৈন্যবাহিনী নিয়ে তিনি শাক্যরাজ্য ধ্বংস করতে গেলেন। বিরুধক

শাক্যদের সঙ্গে এমন প্রাণপণ যুদ্ধ করলেন যে সব শাক্য যুদ্ধে নিহত হল ও তাদের রাজধানী কপিলাবস্তু ধুলিসাৎ হয়ে গেল।

কিন্তু বিরুধককে শ্রাবস্তীপুরে ফিরতে হয় নি। মগধের সম্রাট অজাতশত্রু কোশল আক্রমণ করলেন। যুদ্ধে কোশলের পরাজয় হয়। অজাতশত্রু কোশল রাজ্যকে শক্তিশালী মগধ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে নেন।

সুন্দর সহর শ্রাবস্তীর মাথা চিরকালের মত নত হয়ে গেল।

যশোধর্মা

সে সময়টা ছিল ভারতবর্ষের ঘোরতর দুর্দিন। মধ্য এশিয়া থেকে দলে দলে হূণরা ভারতবর্ষ আক্রমণ করত। কোন বাধা বা প্রতিরোধ তারা মানত না। সব ধ্বংস করে তারা এই দেশে প্রবেশ করত। যেখান দিয়ে ওরা যেত সে সব জায়গা লুঠ

করে, লোকজন নিহত করে একেবারে ছারখার করে দিত। বিখ্যাত গুপ্ত সাম্রাজ্য হূণদের হাতে এ ভাবে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যায়।

হূণদের দলপতি তোরামানা মালওয়াতে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করায় মালওয়াধিপতি সেখানে থেকে মনদসুর নামক একটি ছোট রাজ্যে পালিয়ে যান। তোরামানার মৃত্যুর পর তার পুত্র মিহিরগুল পিতার সিংহাসনে বসলেন। সে তার পিতার চেয়ে অধিক নিষ্ঠুর ও দুষ্ট প্রকৃতির ছিল।

মালওয়া রাজার পুত্র যশোধর্মা। তিনি ছিলেন উচ্চাভিলাষী গুণবান যুবক।

তাঁর হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধার করবার জন্য তিনি সচেষ্ট হলেন। তাঁর স্বপ্ন ছিল—এক বিরাট সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করাবার, যেখানে তাঁর প্রজারা সুখে শান্তিতে বাস করবে।

ষোল বছরের যশোধর্মা স্থির থাকতে পারছিলেন না। তাঁর দেশ ও লোকদের দেখার জন্য তিনি অস্থির হয়ে পড়েছিলেন। প্রজারা কিভাবে দিন কাটাচ্ছে তা স্বচক্ষে দেখবার জন্যে ও শাসকদের প্রতি তাদের কি মনোভাব তাও জানবার জন্যে তাঁর মালওয়া যাবার ইচ্ছা হল। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল প্রয়োজন হলে তাদের উপর কতটা নির্ভর করা যাবে তাও সেই সঙ্গে যাচাই করে নেওয়া।

পিতার কাছে অনুমতি নিয়ে তাঁর কয়েকজন বিশ্বাসী বন্ধুর সঙ্গে দীর্ঘ পথের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। তারা প্রত্যেকে বেছে বেছে তাদের সব চেয়ে ভাল ঘোড়াতে চড়ে বসলেন। অনেক গ্রাম ও নগর পার হয়ে তারা চললেন।

পথে পড়ল ঘন জঙ্গল, দুর্গম পাহাড়, ভয়ঙ্কর নদী। এ সব তারা পার হয়ে এগিয়ে চললেন মালওয়ার উদ্দেশ্যে। কখনো অপরিচিত ভ্রমণকারী বলে পরিচয় দিয়ে দরিদ্র লোকেদের সঙ্গে রাত কাটালেন, কখনও বা রাজ অতিথি হয়ে রইলেন। কয়েকবার পথে ডাকাতদের সঙ্গে লড়াই করে তাদের প্রাণ বাঁচাতে হল, আবার কখনো ছোট খাট যুদ্ধও করতে হল। এই ভাবে তারা আপদ বিপদ কাটিয়ে চলতে লাগলেন।

একদিন তারা যখন ঘন জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিলেন যুবরাজ একটা বন্য বরাহ দেখতে পেয়ে তাকে তাড়া করলেন। বন্য বরাহটা এত জোরে ছুটতে লাগল যে তাকে ধরতে যুবরাজ নিজের সঙ্গীদের কাছ থেকে দূরে গিয়ে পড়লেন। তখন গ্রীষ্মকাল। এত জোরে বরাহ তাড়া করে আসায়

যুবরাজ ক্লান্ত ও তৃষ্ণার্ত হয়ে পড়লেন। চারিদিকে জলের সন্ধান করেও কোথাও জল পেলেন না। ক্লান্ত ও তৃষ্ণার্ত যুবরাজ ঘোড়ার পিঠে চড়ে চলতে লাগলেন।

অনেকটা চলার পর একটা নদী তার চোখে পড়ল। উঁচু পাহাড় থেকে তোড়ে নদীর স্রোত বয়ে চলেছে। জল দেখে খুব আনন্দে ক্লান্তি ও তৃষ্ণা মেটাতে যুবরাজ নদীর মধ্যে দৌড়ে নেমে গেলেন। নদীর প্রবল স্রোতে নিজেকে সামলাতে পারলেন না—স্রোতে তাঁকে টেনে নিয়ে যেতে লাগল। সাঁতরে তীরে উঠবার চেষ্টা করলেন কিন্তু খরস্রোতে তিনি তা পারলেন না। শেষে তাঁর ভয় হল, হয়ত তিনি ডুবে যাবেন।

পাথরের উপর দাঁড়িয়ে একটি মেয়ে তার কলসী ভরছিল। সে সেখান থেকে দেখতে পেল একজন জলে ডুবে যাচ্ছে ও বাঁচবার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করছে। এভাবে যশোধর্মা যখন তার কাছ দিয়ে ভেসে যাচ্ছিলেন সে তাড়াতাড়ি তাঁর জামা-কাপড় ধরে তার সমস্ত শক্তি দিয়ে তাঁকে ডাঙ্গায় টেনে তুলল। রাজপুত্র তখন অজ্ঞান। মেয়েটি তাঁকে শুশ্রূষা করে তাঁর জ্ঞান ফিরিয়ে আনল।

চোখ খুলে তিনি প্রথম দেখলেন ঐ মেয়েটিকে, যে তার প্রাণ বাঁচিয়েছে।

"তুমি কে? তোমার নাম কি?" রাজকুমার তাকে জিজ্ঞাসা করলেন।

"আমার নাম মল্লিকা। আমি কাছেই বাবার সঙ্গে থাকি। বাবা পুরোহিত।"

যশোধর্মা খুবই কৃতজ্ঞ বোধ করলেন। তাকে বললেন, তুমি আমার জীবন বাঁচিয়েছ। তুমি যা করেছ তা টাকা দিয়ে অথবা রাজত্ব দিয়ে শোধ করা যায় না। আমি একজন রাজপুত্র। তুমি কি আমাকে বিয়ে করবে?"

মেয়েটি বিয়ের কথায় লজ্জা পেল না। সে বলল, "আপনি ক্ষত্রিয় আর আমি ব্রাহ্মণ-কন্যা। যুদ্ধ-বিগ্রহ করা আপনার ধর্ম। আমার বাবা একজন নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ। এখন বৃদ্ধ হয়েছেন। আমি আপনাকে বিবাহ করতে পারিনা। আপনি আমাকে ক্ষমা করবেন।"

সে মেয়েটি আরো বলল, "আমি আপনাকে সাহায্য করতে পেরেছি এটা আমার সৌভাগ্য। আপনি আমাকে আপনারই এক বোন বলে ভাববেন। আমি যা করেছি সেটা আমার কর্তব্য, তার জন্যে আমি কোন প্রতিদান চাই না।"

তার কথা শুনে যশোধর্মা খুবই সন্তুষ্ট হলেন।

"খুব ভাল কথা—আজ থেকে তুমি আমার বোন হলে। তুমি আমায় কথা দাও যে যদি কখনও অসুবিধায় পড়ো আমাকে মনে করবে। তোমার জন্যে কিছু করতে পারলে আমি নিজেকে খুব কৃতার্থ মনে করব।"

এ কথা বলে যুবরাজ তাঁর আঙ্গুল থেকে একটি হীরার আংটি নিয়ে মল্লিকাকে দিলেন।

এই আংটি তোমার কাছে রেখে দাও। যখন তোমার কোন সাহায্যের দরকার হবে এটা আমার কাছে পাঠিয়ে দিও। ওটা পেলেই যত তাড়াতাড়ি পারি আমি তোমার কাছে চলে আসব।

মল্লিকা হেসে তার রাজপুত্র-ভায়ের কাছ থেকে আংটিটা নিয়ে নিজের কাছে রেখে দিল।

কয়েক বছর কেটে গেল। মল্লিকা বিয়ের পর মথুরায় স্বামীর ঘরে চলে গেল। এদিকে হূণ দলপতি মিহিরগুলের নানা প্রকার অন্যায় অত্যাচার বেড়েই চলল। কেউ তাকে নৃশংস কাজ থেকে নিবৃত্ত করতে পারছিল না।

মিহিরগুল একদিন মথুরা আক্রমণ করে লুঠপাট আরম্ভ করল। তাঁর সৈন্যরা মল্লিকা, মল্লিকার স্বামী ও তাদের ছেলেমেয়েদের বন্দী করল। হূণ সেনাপতি ওদের মুক্তি দিতে রাজি হল যদি তার ছেলে ওদের সৈন্য বাহিনীতে যোগ দেয় ও কোন এক হূণ সৈনিকের সঙ্গে তার মেয়ের বিবাহ দেওয়া হয়। মল্লিকা ও তার স্বামী এতে রাজি না হওয়ায় তাদের বন্দীশালায় পাঠান হল। তাদের অনেক দুঃখে দিন কাটতে লাগল। মল্লিকা মুক্তির জন্য এর ওর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করল। অবশেষে

যশোধর্মার ছোট-বালকের মত মুখটা তার মনে পড়ল। তাঁর দেওয়া প্রতিশ্রুতিও তার মনে পড়ল। সে মনে করল তার রাজপুত্র-ভাই কি তাকে এ সময় কিছু সাহায্য করতে পারে? তার কি এখনও তার কথা মনে আছে? এই হীরার আংটি দেখলে কি তার প্রতিশ্রুতির কথা মনে পড়বে? মল্লিকার তার দুর্দশার কথা তাকে জানাতে ইচ্ছা হল। কিন্তু ও কি করে তার কাছে খবর পাঠাবে? তার কাছে এ আংটিই বা কে নিয়ে যাবে?

কোন কারণে একজন হূণ যুবক মল্লিকার কাছে খুব কৃতজ্ঞ ছিল। সে যুবকটি যুদ্ধে গুরুতর আহত হয়ে পড়েছিল। মল্লিকা তার সেবা শুশ্রূষা করে তাকে বাঁচিয়ে তোলে। সে তার বাবার কাছ থেকে শিখেছিল কি করে ক্ষতস্থান সারিয়ে তুলতে হয়। এই সৈনিক তাদের জন্য ফল আনত যা খেয়ে মল্লিকা ও তার স্বামী বেঁচে ছিল।

তার আংটিটা যশোধর্মার কাছে পৌঁছে দিতে মল্লিকা সেই সৈনিককে অনুরোধ করল। তাতে সে জানাল এ রকম কাজ করতে তার বিপদের আশঙ্কা আছে। মল্লিকার অনেক অনুরোধে শেষ পর্য্যন্ত আংটি পৌঁছে দিতে সে রাজী হল।

সে সময়ে যে কয়েকজন মাত্র রাজা স্বাধীন ছিলেন ও তাদের বিরাট শক্তি-শালী সৈন্যবাহিনী ছিল, যশোধর্মা তাদের অন্যতম। অনেক রাজাই হূণদের কাছে তাদের রাজ্য ও সিংহাসন হারিয়েছিলেন। ভারতীয় রাজাদের একতার অভাবের জন্য হূণরা তাদের পরাজিত করে এত প্রতাপশালী হতে পেরেছিল। হূণরা যখন এক রাজ্য আক্রমণ করত তখন অন্য রাজারা হয় দূরে সরে থাকত অথবা হূণদেরই সাহায্য করত। অনেক রাজাই হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধারের জন্য যশোধর্মার কাছে সাহায্য প্রার্থী হয়ে এল। যশোধর্মা এ সব রাজাদের সাহায্যের প্রস্তাবে খুব ভরসা করতে পারলেন না, যার ফলে তিনি হূণদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে চাইছিলেন না।

যশোধর্মার কাছে একদিন অনেক রাজা ও রাজদূত হূণদের কুখ্যাত রাজার একছত্রাধিপতি হবার উচ্চাকাঙ্খা চূর্ণ করবার জন্য অনুরোধ উপরোধ করছিলেন। কিন্তু হূণদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হতে তিনি চাইছিলেন না। তিনি তাদের বললেন, "আপনাদের একতার অভাব এই সর্বনাশের মূল কারণ—এখন আপনারা আপনাদের দুর্দশা মোচনের জন্য আমার সাহায্য চাইছেন। আমি আপনাদের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি সময় হলে আমি হূণদের পরাজিত করব। তবে এখনও সে সময় হয় নি।"

ঠিক সেই সময়ে এক রাজঅনুচর সভায় এসে খবর দিল—একজন হূণ সৈনিক তার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। এরকম একজন হূণ সৈনিক আসায় যশোধর্মা বিস্মিত হলেন, কিন্তু তাকে রাজসভায় উপস্থিত করাতে আদেশ দিলেন। হূণ সৈনিক রাজসভায় ঢুকে তাঁকে কুর্ণিশ করে মল্লিকার দেওয়া হীরার আংটি দেখাল। তারপর বলল, "যে মহিলা এই আংটি পাঠিয়েছেন তিনি এখন মথুরায় বন্দী হয়ে আছেন।"

আংটি দেখে যশোধর্মার সব কথা মনে পড়ল। মল্লিকার জন্যই তিনি এখনও জীবিত আছেন ও সিংহাসনে বসে রাজত্ব করছেন। যখন মল্লিকা বিপদে পড়েছে তখন নিশ্চয়ই তার সাহায্যের জন্য তাঁকে যেতে হবে।

যশোধর্মা দাঁড়িয়ে উঠে সর্বসমক্ষে হূণদের সঙ্গে যুদ্ধ করার সঙ্কল্প ঘোষণা করলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সৈন্য বাহিনীকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে হুকুম দিলেন ও কাল বিলম্ব না করে যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে অগ্রসর হলেন। পূর্ব প্রতিশ্রুতি মত অনেক রাজা তাঁকে সাহায্য করলেন।

হূণ ও যশোধর্মার সৈন্যদের মধ্যে ভীষণ যুদ্ধ হল। হূণরা সে যুদ্ধে সম্পূর্ণ পরাজিত হয়ে প্রাণ বাঁচাতে যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে পালিয়ে গেল।

যশোধর্মা দ্রুতগতিতে মল্লিকাকে দেখতে মথুরা গেলেন। কিন্তু মথুরা পৌঁছতে তাঁর অনেকদিন সময় লাগল।

তিনি যখন মথুরা পৌঁছলেন মল্লিকা তখন আর বেঁচে নেই।

যশোধর্মা মর্মান্তিক দুঃখ পেলেন যে তার জীবনদাত্রী মল্লিকা বেঁচে নেই। যদিও মল্লিকাকে বাঁচাতে পারলেন না যশোধর্মা, কিন্তু মাতৃভূমিকে হূণদের অত্যাচার থেকে রক্ষা করলেন।

পৃথ্বীরাজ চৌহান

পৃথ্বীরাজ দিল্লীর মসনদে শেষ হিন্দু রাজা। তিনি ছিলেন এক মহান রাজা। তাঁর প্রজারা তাকে ভালবাসত। তাঁর মহান কীর্তির নানা রকম গল্প প্রচলিত আছে। এমন কি, এখনও লোকেরা তাঁর যশোগাথা গান করে ও তাঁর বিজয়-উৎসব পালন করেন।

মহম্মদ ঘোরী হিন্দুস্থান অভিযান করে পৃথ্বীরাজের রাজ্য আক্রমণ করে। পৃথ্বীরাজের আরো শক্তিশালী সৈন্য ছিল, তিনি ঘোরীকে পরাজিত করলেন। ঘোরীর অনেক সৈন্য যুদ্ধে নিহত হল আর অনেকে পালিয়ে প্রাণ বাঁচাল। ঘোরী নিজে পৃথ্বীরাজের সৈন্যদের হাতে বন্দী হল। বন্দী ঘোরীকে পৃথ্বীরাজের কাছে আনা হল। তিনি তাকে যথোচিত সম্মান দেখালেন ও তাকে মুক্তি দিলেন।

মহম্মদ ঘোরী দেশে ফিরে গেল। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে আরো বড় এক সৈন্য-বাহিনী নিয়ে হিন্দুস্থান অভিযান করে পৃথ্বীরাজের রাজ্য আক্রমণ করল।

আবার দুই সৈন্যের মধ্যে ঘোরতর যুদ্ধ হল। সে যুদ্ধেও ঘোরী পরাজিত হয়ে বন্দী হল। পৃথ্বীরাজ তাকে ধমক দিয়ে এবারেও মুক্তি দিলেন।

ঘোরী পৃথ্বীরাজ চৌহানের ঐশ্বর্যশালী সমৃদ্ধ রাজ্য জয় করার সঙ্কল্প করল। সে আরো সৈন্য সংগ্রহ করে দিল্লীর দিকে এগিয়ে এল। তৃতীয়বারে সে পরাজিত ও বন্দী হল। তৃতীয়বারও পৃথ্বীরাজ তাকে মুক্তি দিলেন। যুদ্ধে বারবার পরাজিত হলেও সে নিবৃত্ত হল না। আরো কয়েকবার সে পৃথ্বীরাজের রাজ্য আক্রমণ করল। প্রতিবারেই সে বন্দী হয় আর পৃথ্বীরাজ তাকে মুক্তি দেন।

পৃথ্বীরাজের বন্ধুরা তাঁকে সতর্ক করে দিয়ে বলেন—এ রকম নীচ শত্রুকে সম্পূর্ণভাবে নিধন করা উচিত, না হলে বিরাট বিপদের সম্ভাবনা আছে। কিন্তু পৃথ্বীরাজ তাঁদের বলতেন, তিনি তাঁর নিজের ক্ষমতা জানেন ও তিনি নিজের

লোকদের উপর নির্ভর করতে পারেন। ঠাণ্ডা মাথায় তিনি কাউকে মারতে পারেন না।

কিন্তু তাঁর নিজের লোকেদের মনের মধ্যে তাঁর নীতি নিয়ে বিরোধ সৃষ্টি হল।

মহম্মদ ঘোরী আর একবার এল। এবার তার সৈন্যবল ছিল প্রচণ্ড। পৃথ্বীরাজের নিজের লোকেদের মধ্যে মতভেদ হয়েছে সেটা সে আন্দাজ করতে পেরেছিল। সে দিল্লী পর্যন্ত এগিয়ে এল। আবার পৃথ্বীরাজ ও ঘোরীর সৈন্যদের মধ্যে ভীষণ যুদ্ধ হল। পৃথ্বীরাজ খুব সাহস ও বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করলেন কিন্তু পরাজিত হলেন। তাঁর অনেক সৈন্যদের সঙ্গে তিনিও বন্দী হলেন।

মহম্মদ ঘোরী সুলতান হয়ে দিল্লীর সিংহাসনে বসল। সে হুকুম দিল পৃথ্বীরাজ ও তাঁর সভাকবি চাঁদ বরদই ছাড়া সমস্ত বন্দীর মাথা কেটে তাদের হত্যা করতে। পৃথ্বীরাজকে দুই চক্ষু অন্ধ করে বন্দী করে রাখা হল।

ঘোরী, চাঁদের লেখা কয়েকটা কবিতা আগে শুনেছিলেন। নিত্য নূতন কবিতা শুনিয়ে কবি চাঁদ তার মনোরঞ্জন করবেন এই ছিল তার ইচ্ছা, আর সে জন্য তাকে হত্যা বা বন্দী করা হয়নি। একদিন ঘোরী চাঁদের মুখে কাব্যে পৃথ্বীরাজের গুণকীর্ত্তন শুনছিলেন। এ রকম একটি কবিতায় চাঁদ বর্ণনা দিচ্ছিলেন, পৃথ্বীরাজ চোখে না দেখে কেবলমাত্র শব্দ

শুনে কিভাবে বন্যজন্তু শিকার করতেন। এই গুণের জন্যে পৃথ্বীরাজ শব্দ-ভেদী নামে পরিচিত ছিলেন। তাদেরই শব্দ-ভেদী আখ্যা দেওয়া হয়, যারা চোখে না দেখে কেবল মাত্র শব্দ শুনে লক্ষ্য বস্তুকে তীরবিদ্ধ করতে পারেন। ঘোরী এ কথা বিশ্বাস করতে পারল না। সে চাক্ষুষ প্রমাণ চাইল। ঘোরী নিজে বন্দী-শালায় পৃথ্বীরাজের সঙ্গে দেখা করে তার এই আশ্চর্য্য ক্ষমতা দেখাতে বলল। পৃথ্বীরাজ অসম্মত হলেন। শেষ পর্যন্ত ঘোরী চাঁদকে বলল—সে যেন তার ভূতপূর্ব মনিবকে এই ক্ষমতা প্রদর্শন করাতে সম্মত করায়।

চাঁদ পৃথ্বীরাজের কাছে গিয়ে ঘোরীর ইচ্ছার কথা নিবেদন করলেন। পৃথ্বীরাজ বিস্মিত হলেন এই ভেবে যে কি করে কবি চাঁদ তাঁর বন্ধু হয়ে তাঁর এই ক্ষমতা দেখিয়ে ঘোরীর মনোরঞ্জনের চেষ্টা করছেন। কিন্তু চাঁদ তাঁকে বললেন, এটা একটা বড় সুযোগ যা তাঁরা হারাতে পারেন না। তাঁরা এই সুযোগে ঘোরীর উপর প্রতিশোধ নিতে পারেন। চাঁদ ও পৃথ্বীরাজ নিজেরা কি করবেন তার একটা পরিকল্পনা ঠিক করলেন।

ঘোরীকে খবর পাঠান হল চাঁদের অনুরোধে পৃথ্বীরাজ তাঁর শব্দ শুনে শিকার করার কায়দা দেখাবেন।

দিন স্থির হল। পৃথ্বীরাজের দক্ষতা দেখবার জন্যে ঘোরী দরবার বসাল। দরবারে সকলে উপস্থিত হলে সেখানে অন্ধ পৃথ্বীরাজকে আনা হল। পৃথ্বীরাজ ঘোরীর সিংহাসনের কিছু দূরে দাঁড়ালেন।

ঘোরী হুকুম দিল—একটা ছাগল, সুলতান ও রাজন্যবর্গ বসবার উঁচু বেদী থেকে অনেকটা দূরে একটা খুঁটিতে বাঁধতে। ঘোরী আরো হুকুম দিল, পৃথ্বীরাজ আওয়াজ শুনতে পায় এভাবে ছাগলটাকে যেন ডাকানো হয়।

ঘোরী যখন এই সব হুকুম দিচ্ছিল পৃথ্বীরাজ শুনছিলেন যা থেকে তিনি ঠিক করতে পারেন ঠিক কোন জায়গায় সুলতান সিংহাসনে বসে আছে।

চাঁদ সে সময়, পৃথ্বীরাজ কি ভাবে না দেখে কেবলমাত্র শব্দ শুনে লক্ষ্যভেদ করতে পারেন সেই গাথা আবৃত্তি করতে

লাগলেন। তাঁর গাথা শেষ করলেন এই বলে—মহামান্য সুলতান আগের মত সিংহাসনে বসে এই খেলা দেখবার জন্যে উদ্‌গ্রীব হয়ে আছেন।

ছাগলটা ডাকবার সঙ্গে সঙ্গে পৃথ্বীরাজ ধনুক তুললেন। তৎপরতার সঙ্গে লক্ষ্য ঠিক করে নিলেন ও একটা তীক্ষ্ণ তীর ছুঁড়লেন—ছাগলের দিকে নয় সুলতান ঘোরীর দিকে।

সেই তীর ঘোরীর বুকে গিয়ে বিঁধল আর ঘোরী মৃত অবস্থায় সিংহাসন থেকে পড়ে গেল।

চক্ষের নিমিষে চাঁদ এগিয়ে এসে পৃথ্বীরাজের গলা কেটে ফেললেন। একই সময়ে পৃথ্বীরাজ চাঁদের গলাও তার তরবারি দিয়ে কেটে ফেললেন।

এইভাবে চাঁদ ও পৃথ্বীরাজ তাদের পরিকল্পনা মত কাজ শেষ করলেন। ঘোরীর লোকেরা পৃথ্বীরাজ কিংবা চাঁদের কোন ক্ষতি করতে পারল না।

কাজীর বিচার

গিয়াসুদ্দিন ছিলেন খ্যাতনামা পাঠান সুলতান। তিনি পূর্ব ভারতের অধিপতি ছিলেন। একদিন শিকার করবার সময় তাঁর একটা তীর এসে একটি ছেলের গায়ে বিঁধে। ছেলেটি ছিল দরিদ্র বিধবার একমাত্র সন্তান। শোকে কাঁদতে কাঁদতে এসে সে বিচারকের কাছে তার অভিযোগ জানাল। তখনকার দিনে বিচারককে লোকে কাজী বলত।

কাজী তার অভিযোগ শুনে উভয়-সঙ্কটে পড়লেন। তিনি যদি অভিযোগ গ্রহণ করেন তাহলে সুলতানকে শাস্তি দিতে হয়। আর যদি বিধবার অভিযোগ গ্রহণ না করেন তবে আল্লার নিকট পাপী হবেন। গভীর ভাবে চিন্তা করে

কাজী বিধবার অভিযোগ গ্রহণ করলেন। বিধবাকে তিনি পরের দিন বিচারালয়ে আসতে বললেন।

এ বিচার করতে হলে সুলতানকেও বিচারালয়ে উপস্থিত হবার পরওয়ানা দিতে হয়। আর সুলতানের কাছে পর-ওয়ানা পাঠাবার একজন লোকও দরকার। কাজী তাঁর এক সহকারীকে এই কাজের ভার দিয়ে সুলতানের কাছে পাঠালেন।

সহকারীটি ভয়ে কাঁপতে লাগল। তবে সে রাজার ভয়ে কাজীর আদেশ যদি অমান্য করে তবে তাকে শাস্তি পেতে হবে। আর যদি সে সুলতানকে পরওয়ানা দেয় তবে তার গর্দান যাবে।

এই পরিস্থিতিতে সে কি করবে এই চিন্তা করতে লাগল। ভাবতে ভাবতে সে সুলতানের প্রাসাদের বাহিরে গিয়ে দাঁড়াল। প্রাসাদের ভিতরে যাবার তার সাহস হল না। এখন সে কি করবে? প্রথমে ভাবল সে ফিরে যাবে। কিন্তু, তাতে কাজী তাকে বরখাস্ত করবে। তখন সে একটা মতলব ভেবে ঠিক করল। সে চীৎকার করে আজান দিতে লাগল। আজান মানে সকলকে প্রার্থনা করবার ডাক দেওয়া আর সেটা প্রার্থনার সময়েই কেবলমাত্র দেওয়া হয়।

সুলতান অসময়ে প্রার্থনার আজান শুনে যে আজান দিচ্ছে তাকে তার কাছে ধরে আনতে হুকুম দিলেন। ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে সে সুলতানের সামনে

হাজির হল। সুলতান তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, কেন সে অসময়ে আজান দিচ্ছিল। লোকটি করজোড়ে নিবেদন করল, "মালিক হুজুর, আমাকে মাফ করুন।" আমার কর্তব্য করতে আমাকে এ কাজ করতে হয়েছে। মহামান্য কাজী আপনাকে তাঁর বিচারালয়ে উপস্থিত হবার পরওয়ানা দিতে আমাকে পাঠিয়েছেন। আপনাকে কাল সকালে বিচারালয়ে তাঁর সামনে হাজির হতে হবে। আপনার কাছে সোজা চলে আসতে আমার ভয় করছিল, তাই আপনার মনোযোগ আকর্ষণ করতে আমি অসময়ে আজান দিয়েছি।

সুলতান ঐ লোকটির জবাবে সন্তুষ্ট হলেন। তিনি তাকে বললেন পরের দিন ঠিক সময়েই তিনি বিচারালয়ে হাজির হবেন।
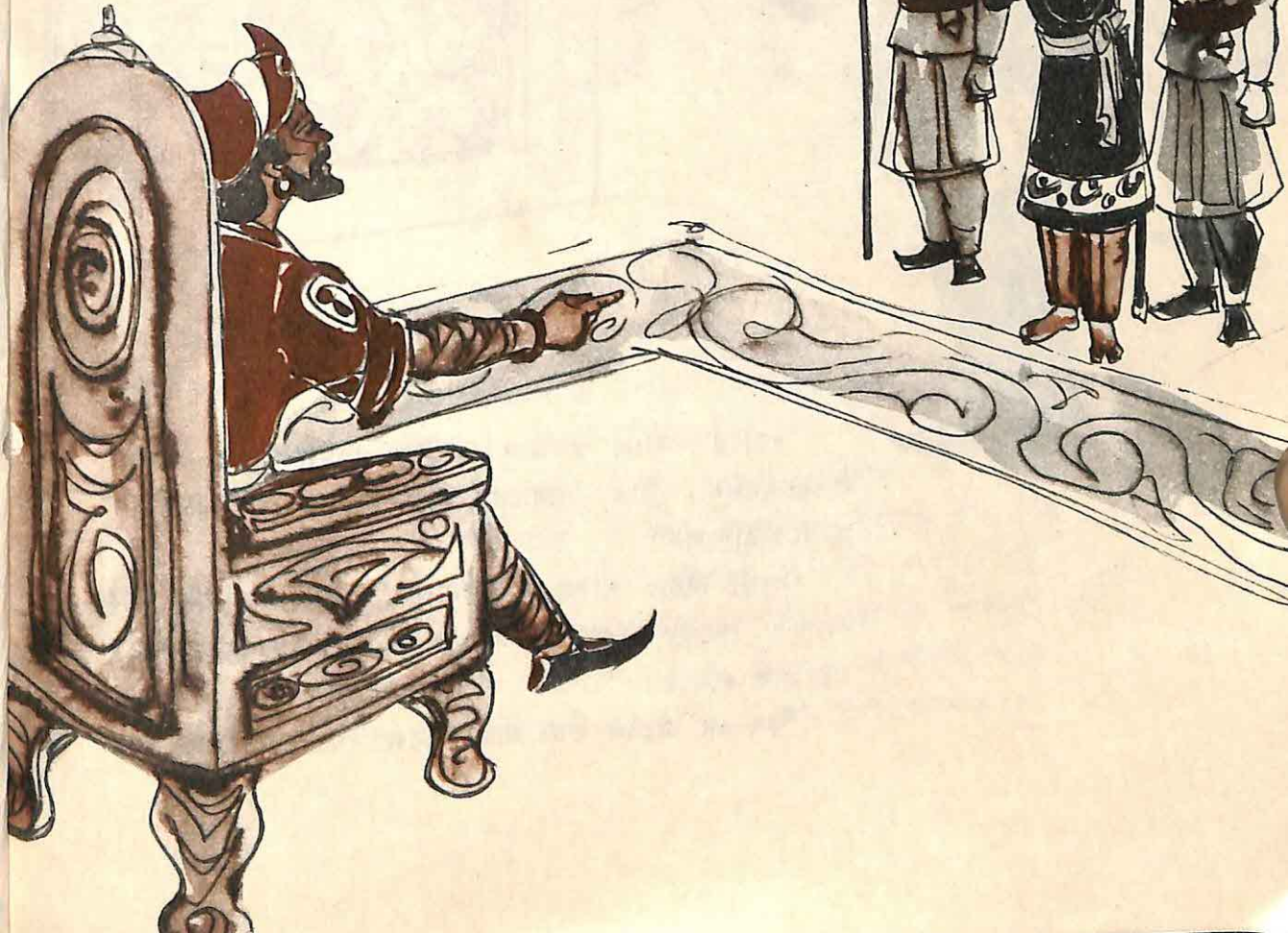
পরদিন সকালে সুলতান কাজীর বিচারালয়ের উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। তাঁর পোষাকের নীচে একটা ধারাল তলোয়ার লুকিয়ে রাখলেন।

কাজী বিচার আরম্ভ করলেন। বিচারালয় লোকে ভরে গেছে। দেশের মালিক সুলতানের বিরুদ্ধে বিচার হচ্ছে দেখতে বহুলোক এসেছে।

সুলতান প্রবেশ করা মাত্র সকলে সসম্ভ্রমে দাঁড়িয়ে উঠল

কিন্তু কাজী দাঁড়ালেন না। তিনি যেমন বসে ছিলেন সে রকমই বসে রইলেন। কাজী বিধবাকে ডেকে তাঁর সামনে তার অভিযোগ বলতে বললেন। বিধবা যা যা ঘটেছিল বলল।

কাজী সব শুনে বললেন, "সুলতান আপনি তীর বিদ্ধ করে এই বিধবার একমাত্র পুত্রকে হত্যা করেছেন। দরিদ্র বিধবার সন্তানকে হত্যা করার অপরাধে আপনি অপরাধী। একমাত্র সন্তান হারানো মানে বিধবার অপরিসীম ক্ষতি। আমার আদেশ, আপনি একে উচিত মত ক্ষতিপূরণ দেবেন।

স্থলতান তৎক্ষণাৎ বিধবার কাছে তাঁর অপরাধ মাফ করার জন্য অনুরোধ করলেন ও আদেশ দিলেন যেন উপযুক্ত সোনা ও জহরৎ দিয়ে বিধবার অভাব অনটন দূর করা হয়।

বিচার শেষ হওয়া মাত্র কাজী সসম্ভ্রমে তাঁর আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন ও স্থলতানকে বসার জন্য যথোচিত সম্মানের সঙ্গে তাঁর কাজীর আসন ছেড়ে দিলেন।

স্থলতান বললেন, "কাজী আমি স্থলতান বলে আপনি যদি স্থবিচারে ইতস্ততঃ করতেন আমি এই তলোয়ার দিয়ে আপনার মাথা কেটে ফেলতাম।"

এই বলে তিনি তাঁর পোষাকের ভিতর থেকে সেই লুকানো ধারাল অস্ত্রটি বার করলেন।

কাজী তাঁর মাথা নত করে বললেন, "মালিক হুজুর, আপনি যদি আমার আদেশ অমান্য করতেন এই চাবুক দিয়ে আপনার পিঠের চামড়া তুলে ফেলতাম।"

তিনি তাঁর আলখাল্লার ভিতর থেকে লুকানো গাঁট বাঁধা একটা চাবুক বার করে স্থলতানকে দেখালেন।

তিনি বললেন, "আল্লার অসীম দয়া যে আমরা পরস্পরের কর্তব্য সম্পন্ন করেছি।"

স্থলতান সন্তুষ্ট হয়ে নির্ভীক কাজীকে আলিঙ্গন করলেন। সমবেত সকলে তাদের সম্মানে জয়ধ্বনি করে উঠল।

গোহ্-র গল্প

বল্লভী, সৌরাষ্ট্রের একটি বিরাট সহর। এই সহর ছিল সূর্য বংশের খ্যাতনামা রাজা শিলাদিত্যের রাজধানী।

শিলাদিত্য ছিলেন একজন প্রবল পরাক্রান্ত রাজা। প্রতিবেশী অনেক রাজ্য জয় করে তিনি তাঁর রাজ্যের সীমানা অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তৃত করেছিলেন। আরো অনেক রাজা তাঁর বশ্যতা স্বীকার করে তাঁকে রাজকর দিতেন।

শিলাদিত্য একজন মহানুভব, দয়ালু ও সৎ রাজা ছিলেন। তিনি তাঁর প্রজাদের সুচারুরূপে শাসন করতেন। তাঁর রাজ্যের সর্বত্র শান্তি ও সমৃদ্ধি

বিরাজ করত। বল্লভী খুবই সমৃদ্ধ সহর ছিল। অনেক আক্রমণকারীর এই বল্লভী শহরের উপর নজর ছিল। তাতাররাও এই সহর আক্রমণ করার সুযোগ খুঁজছিল।

শিলাদিত্যের রাণী পুষ্পবতী ছিলেন পরমা সুন্দরী ও উচ্চমনা। যেদিন তাঁদের একটি পুত্র-সন্তান ভূমিষ্ঠ হল রাজ্যের লোকেরা খুব ধূমধাম করল। সমস্ত সহর আনন্দে মেতে উঠল আর সমস্ত রাত্রি ধরে ভোজপর্ব ও আনন্দমেলা চলল।

কিন্তু তাতাররা রাজ্যের কয়েকজন মন্ত্রী ও সেনাপতির সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে রেখেছিল। তারা এই সব অসৎ মন্ত্রীদের ও রাজকর্মচারীদের অনেক টাকা দিয়েছিল। তারা টাকার বিনিময়ে রাজার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করতে রাজী হয়েছিল।

সমস্ত সহর যখন রাজকুমারের জন্ম উপলক্ষে মত্ত, তাতাররা সেই সুযোগে সহর আক্রমণ করল। শিলাদিত্য বীরের মত খুব যুদ্ধ করলেন। কিন্তু, তাঁরই বিশ্বাসঘাতক রাজকর্মচারীদের সাহায্যে তাতাররা তাঁকে পরাজিত করল। শিলাদিত্য সে যুদ্ধে নিহত হলেন। তাতাররা সহর লুঠপাট করে এক ধ্বংসস্তূপে পরিণত করল।

রাণী পুষ্পবতী সঙ্গে নবজাত শিশু, বিশ্বস্ত পরিচারিকা কমলা ও অন্যান্য কয়েক-জন অনুচর নিয়ে সহর ছেড়ে পালিয়ে গেলেন। প্রথমে তাঁরা একটি মন্দিরে আশ্রয় নিলেন। যখন বুঝতে পারলেন, সেখানেও তাঁরা নিরাপদ নন, কারণ তাতাররা রাণী ও শিশু রাজকুমারকে খুঁজতে খুঁজতে মন্দিরের কাছাকাছি এসে পড়েছে ; তখন রাণীর সকল অনুচরেরা তাঁকে ছেড়ে গেল, গেল না কেবল কমলা।

শেষে তাঁরাও মন্দির ছেড়ে চলে যাওয়া ঠিক করল। গভীর রাত্রে চুপি চুপি সেখান থেকে পালিয়ে তাঁরা দূরে এক গুহায় আশ্রয় নিলেন। সেখানে রইলেন তাঁরা তিনজন—রাণী, শিশু-রাজকুমার ও কমলা।

রাণী পুষ্পবতী স্বামীর মৃত্যু-শোক সহ্য করতে না পেরে অসুস্থ হয়ে পড়লেন। ক্রমশঃ তাঁর অবস্থা খারাপ হতে লাগল। একদিন তিনি তাঁর শিশুর ভার কমলার হাতে দিয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন।

কমলার খুবই দুঃখ হল, কিন্তু তার মনের খুব জোর ছিল। সে ঠিক করল, সে সযত্নে রাজকুমারকে প্রতিপালন করবে। কিন্তু নির্জন গুহায় থেকে তা সম্ভব নয় বলে, সে তার বাপ-মার কাছে চলে গেল।

তার বাবার বাড়ী সেখান থেকে অনেক দূরে, পথও ছিল কষ্টকর। দিনের বেলা এতটা পথ যেতে তার ভয় করত। যদি শত্রুরা তাকে ও রাজকুমারকে চিনে ফেলে, সেইজন্যে, সে রাত্রে পথ চলত আর দিনের বেলায় লুকিয়ে থাকত।

অনেকদিন এই কষ্ট সহ্য করে শেষে সে তার বাপের বাড়ী বীরনগরে এসে পৌঁছল। সেখানে সে রাজকুমারকে নিজের ছেলের মত করে মানুষ করল। তার সাধ্যমত তাকে পড়াশোনা করাল ও নানা রকম শিক্ষা দিল। সে তার নাম রাখল গোহ্।

বীরনগর ছিল একটি ভীল রাজ্যের উপকণ্ঠে। গোহ বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অনেক ভীল বালক ওর খেলার সাথী ও বন্ধু হয়ে উঠল।

দুঃসাহসিক কাজ করতে গোহ্‌র ভাল লাগত। ভীল ছেলেদের সঙ্গে সে গভীর বনে-জঙ্গলে শিকার করতে যেত। গোহ্ তাদের মধ্যে সেরা শিকারী হয়ে উঠল। ছেলেরা তাকে সর্দার বলে ভাবত।

ঐ বন অঞ্চলে মন্দালিক ছিল ভীলদের সর্দার। এই ভীল রাজ্য শিলাদিত্যের অধীন ছিল। মন্দালিক তাঁকে এক বিরাট রাজা বলে শ্রদ্ধা করতেন। শিলাদিত্যের মৃত্যুর পর মন্দালিক স্বাধীন হল। কিন্তু তিনি শিলাদিত্যের যোগ্য উত্তরাধিকারীর খোঁজ করছিলেন যাঁকে তিনি রাজা বলে গ্রহণ করতে পারেন।

বাৎসরিক উৎসবের দিনটি ভীলেরা খাওয়া-দাওয়া ও নাচ-গানের মধ্যে কাটায়।

সেদিন গোহ. ও তার বন্ধুরা ঘন বনে শিকারে গেল। একটা ভয়ঙ্কর বন্য-বরাহ হঠাৎ গোহ.র দিকে ছুটে গেল। গোহ. খুব সতর্কতা ও সাহসের সঙ্গে তাকে পাশ কাটিয়ে তার গলায় একটা ধারাল বর্শা বিঁধে দিল। তারপর তার উপর লাফিয়ে পড়ে একটা ছোরা দিয়ে মারতে লাগল, যতক্ষণ না সেটা মরে গেল। ছেলেরা তাদের সর্দারের বীরত্ব দেখে আনন্দে নাচতে লাগল। তাকে তারা জড়িয়ে ধরল ও তার মাথায় পুষ্পবৃষ্টি করতে লাগল। এই উৎসব উপলক্ষ্যে ছেলেরা সেই বন্য বরাহটাকে নিয়ে গিয়ে তাদের সর্দারকে উপহার দেবার মতলব করল।

গোহ তাতে রাজী হল। তখন ছেলেরা মিলে সেই বিরাট বরাহটাকে বয়ে নিয়ে সর্দারের কাছে হাজির করল। গোহ.ও তাদের সঙ্গে সঙ্গে গেল।

মন্দালিক একটা বড় পাথরের সিংহাসনে বসেছিলেন ও ভীলেরা তাকে ঘিরে

বসেছিল। সেখানে নাচ ও গান-বাজনা হচ্ছিল। সবার সামনে ছেলেরা সর্দারকে সে বরাহ উপহার দিল। তিনি বরাহটাকে দেখেই চিনতে পারলেন যে সেটাকে তিনি কয়েকবার মারবার চেষ্টা করেও মারতে পারেন নি।

"কে এই বিরাট বরাহটাকে মেরেছে?" তিনি জিজ্ঞাসা করলেন।

গোহ্-র দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে একটি ছেলে বলল, এ মেরেছে।

'তুমি কে? তোমার নাম কি?" মন্দালিক জিজ্ঞাসা করল।

অন্য একটি ছেলে তার হয়ে বলল, "ওর নাম গোহ্। ওরা এই বনের ধারে থাকে। ওরা ব্রাহ্মণ আর আমাদের বন্ধু। আমরা এক সঙ্গে খেলা করি ও শিকারে যাই।"

মন্দালিক চেঁচিয়ে বলে উঠলেন, "কি বললে? ব্রাহ্মণের ছেলে! ব্রাহ্মণের ছেলে কি করে এরকম চমৎকার শিকার করতে পারবে?"

গোহ্ বললে, "হ্যাঁ, আমি ব্রাহ্মণের ছেলে। আর আমি এই বন্য বরাহটাকে শিকার করেছি।"

মন্দালিক এ কথা বিশ্বাস করতে পারলেন না। তিনি গোহ্‌র গলায় একটা কবচ দেখতে পেলেন। তখনকার দিনে প্রথা ছিল যে সন্তানের জন্মের পরই তার বাবা কি মা যে কেউ একজন তার গলায় কিংবা কোমরে একটা কবচ বেঁধে দিতেন যাতে তার কোন অমঙ্গল না হয়। সেই কবচের ভিতরে পিতা মাতার নাম লেখা থাকত। পুষ্পবতী এ রকম একটা কবচ তাঁর ছেলের গলায় বেঁধে দিয়েছিলেন।

মন্দালিক সেই কবচ দেখিয়ে বললেন, "ঐ কবচ খুলে আমাকে দাও।"

গোহ্ চেঁচিয়ে বলল, "না আমি দেব না।"

মন্দালিক তাঁর লোকদের হুকুম দিলেন গোহ্-র গলা থেকে কবচটা খুলে তাঁর হাতে দিতে। গোহ্ মনে করল ওরা তাকে অপমান করছে। সেইজন্যে যে কবচ খুলতে তার কাছে এল তার সঙ্গে সে লড়াই করল। কিন্তু এত লোকের বিরুদ্ধে সে একা। এভাবে শেষ পর্যন্ত তার লড়াই করবার ক্ষমতা ছিল না। তারা জোর করে তার কবচ খুলে নিল। কবচ খুলে মন্দালিক যখন তার বাবার নাম পড়লেন তখন বুঝলেন এই বীর বালকের যথার্থ পরিচয়।

ভীল সর্দারের খুব আনন্দ হল। তিনি গোহ্কে তৎক্ষণাৎ কোলে বসিয়ে জড়িয়ে ধরলেন। আনন্দে তাঁর গাল বেয়ে চোখের জল পড়তে লাগল।

শিলাদিত্যের বংশধরকে তিনি খুঁজে পেয়েছেন, যাঁকে তিনি তাঁদের রাজা করতে পারেন। সেই বালককে পাথরের সিংহাসনে বসিয়ে তার মাথায় ফুলের রাজ-মুকুট পরিয়ে দিলেন।

তারপর সবাইকে শুনিয়ে জোর গলায় বললেন, এই বালক তাদের রাজা, তারা যেন তাঁকে রাজসম্মান দেয়।"

কমলা ও তার বাবা সমস্ত খবর শুনে তাড়াতাড়ি এসে যখন সেখানে উপস্থিত হল—তারা দেখল বালক গোহ্ ভীলদের রাজা হয়েছে।

রাজা গোহ্ বড় হয়ে আরো সাহসী ও আরো সুচতুর হয়েছিলেন। "ভীলদের রাজা" এছাড়া আর কোন নাম তিনি নেননি। কিন্তু তাঁর বংশধরদের জন্য একটা নাম প্রয়োজন হল। কমলা তাঁকে গোহ্ নাম দিয়েছিল। তার সম্মানের জন্য তিনি তার বংশের নাম রাখলেন 'গেহ্লট্'।

ষাট বৎসর পর তাঁর এক বংশধর বাপ্পা গেহ্লট্ উত্তর ভারতের মেবার থেকে কাবুল কান্দাহার পর্যন্ত একটা বিরাট ভূখণ্ডের উপর রাজত্ব করেছিলেন।